দ্য ম্যান ইন দ্য পিকচার

সুজান হিল

ভাষান্তর ও সম্পাদনা

পারভেজ মাহমুদ রাজীব

তাম্রলিপি

উৎসর্গ

আমার বাবা,
মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন স্মরণে

অনুবাদকের কথা

‘ঠিক ভৌতিক নয় এ উপন্যাস, বরং অতিপ্রাকৃত বলাই শ্রেয়। প্রখ্যাত ব্রিটিশ লেখিকা সুজান হিলের একটি অনবদ্য লেখা। নিজে পড়তে গিয়ে যেমন মুগ্ধ হয়েছি, সেই অনুভূতিই ভাগ করে নিতে চেয়েছি বাংলা বইয়ের পাঠকদের সাথে।’

পারভেজ মাহমুদ রাজীব
সিরাজনিবাস
উত্তরা, ঢাকা

সে রাতে শীত পড়েছিল প্রচণ্ড। জানুয়ারি মাস। কেমব্রিজে আমার প্রাক্তন প্রফেসর থিওর কোয়ার্টারে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে শুনেছিলাম এ গল্প। বেশ অনেকদিন আগের কথা। ফুর্তি আর হইহুল্লোড়ে ভরা এক জীবন কাটাচ্ছি তখন। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে বেরোনো এক তরুণ আমি, জীবনকে মনে হতো বহু শিল্পীর আঁকা অনেক রঙে সাজানো এক দারুণ চিত্রকর্ম, আমার চোখে এই শিল্পীদের একজন ছিল থিও।

প্রফেসর থিও পারমিটার ছিলেন আমাদের সেসময়কার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রদের মধ্যে একজন। মূলত ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ছিলাম থিওর প্রিয় ছাত্রদের একজন। পাশ করে বেরোনোর পরেও কয়েক সপ্তাহ পরপরই সপ্তাহান্তে লন্ডন থেকে কেমব্রিজে চলে যেতাম ওর সাথে দেখা করতে, ওর অন্য ভক্তদের কেউ কেউও চলে আসত, বেশিরভাগই আমার বন্ধু। আড্ডায়, গল্পে কেটে যেত দুটি দিন। গল্প বলতে সে ছিল খুব ওস্তাদ। তাকে আমরা দেখেছিলাম আমাদের প্রথম যৌবনের সক্রেটিস হিসেবে। যে সময়ের কথা বলছি তখন থিও অবসরে। অবশ্য ইউনিভার্সিটির পুরনো কোয়ার্টারেই সে তখনও থাকতো, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চাকরিরত অবস্থাতেই এ ব্যাপারে অনুমতি পেয়ে গিয়েছিল। যদিও চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়া কারো প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আচরণ ছিল অতি বিরল, থিওর ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয় কারণ সে ছিল কর্তৃপক্ষ, ছাত্র, সহকর্মী সবার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। চিরকুমার মানুষ, সেই বিরল শিক্ষক সম্প্রদায়ের সদস্য যাদের ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজন সবই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় সে ওই কোয়ার্টারে কাটিয়েছে এবং ওখানেই আমৃত্যু থেকে যাবে।

অবশ্য থিও নিজেও উন্মুখ হয়ে থাকত আমাদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য। আমি টানা কয়েক মাস না গেলে নিজেই খবর পাঠাত। তবে একথা

শুনে যদি এমনটা মনে হয় যে এটা ছিল এক অশীতিপর বৃদ্ধের নিঃসঙ্গতা এড়ানোর প্রচেষ্টা, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। যদিও আমরাই ছিলাম বাইরের পৃথিবীর সাথে তাঁর একমাত্র যোগাযোগের উপায় এবং থিও আমাদের কাছ থেকে নানারকম সামাজিক কেচ্ছা শুনতে খুব পছন্দও করত, বিশেষ করে তাঁর প্রাক্তন ছাত্ররা কে জীবনে উন্নতি করল, কে চাকরি হারাল, কে কোথায় কোন স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়ল—এসব বিষয় ছিল ওর পরম উপভোগের বস্তু, তবু বলতে হয় যে এই আড্ডাগুলোতে যোগদানের মুল আগ্রহ ছিল আমাদেরই। আর তার কারণ ছিল থিওর আশ্চর্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতার ঝুলি আর নানারকমের দুষ্টুমিভরা কথা আর কাজ যা সে এ বয়সেও ছাড়তে পারেনি। চৌম্বকীয় এক আকর্ষণ ছিল ওর মাঝে এবং সত্যি বলতে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে খাবার টেবিলে ওর পাশে কে বসবে তা নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলত।

এটা যে বারের ঘটনা, সেবার আমি লন্ডন থেকে দুপুরের পর রওনা দিয়ে ডিনারের ঠিক আগে আগে পৌঁছেছিলাম কেমব্রিজে ওর বাসায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন লম্বা ছুটি চলছে, ক্যাম্পাস জনমানবশূন্য। এক বোতল পোর্ট ওয়াইন আর চমৎকারভাবে রান্না করা টার্কির মাংস দিয়ে ডিনার সেরে আরাম করে বসলাম আমরা দুজন ফায়ারপ্লেসের পাশে, আমি আমার প্রিয় সোফায়, আর ও ওর প্রিয় বহু পুরানো এক রকিং চেয়ারে। বাইরে তখন কনকনে হাওয়া বেশ শব্দ করে বইছে, জানালার শার্শিগুলো থেকে থেকেই কেঁপে উঠছিল হাওয়ার ঝাপটায়।

এটা সেটা নিয়ে বিশ্রম্ভালাপ চলছিল। ফায়ারপ্লেসের আরামদায়ক উষ্ণতায় কখন যে দুচোখ জড়িয়ে এসেছে টের পাইনি, ভেবেছিলাম থিওও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে সে আবার কথা বলতে শুরু করল—

একটা পুরনো অদ্ভুত ঘটনা খুব মনে পড়ছে। শুনবে নাকি গল্পটা, অলিভার?

নিশ্চয়, সেজন্যেই তো আসা।

'সত্যি বলতে কী, অদ্ভুত এবং অস্বস্তিকর' বলে সে চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসতে গিয়ে ককিয়ে উঠল। বেচারা বাতের ব্যথায় সত্যি কাবু হয়ে পড়েছিল।

আমি খুশি হয়ে উঠলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে থিওর এসব বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প খুব জনপ্রিয় ছিল আমাদের মধ্যে। আর তার অভিজ্ঞতার ঝুলি বিশাল!

অধ্যাপনা ছাড়াও কত বিচিত্র কাজই না করেছে মানুষটা জীবনে। বললাম, ‘আরে অবশ্যই, এই আবহাওয়ায় এরকম গল্পই তো চাই। শুরু করো।’

আমার ঔৎসুক্য কিন্তু থিওকে স্পর্শ করল না। দেখলাম সে এক দৃষ্টে মোমবাতির শিখার দিকে তাকিয়ে আছে, চেহারায় ফুটে উঠেছে এক অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য। বেশ অনেক মুহূর্ত পর সে মোমের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বলল, ‘বলছি, আর বলার আগে এটা তোমাকে জানিয়ে রাখছি যে কাহিনী তোমাকে শোনাতে যাচ্ছি, বিশ্বাস কর আর নাই কর, তার প্রতিটি কথা সত্যি।’

অধৈর্য হয়ে বললাম, ‘আচ্ছা শুরু তো হোক, সত্যি মিথ্যা পরে দেখা যাবে।’ ‘তা হলে ওই হুইস্কির বোতল আর গেলাসটা এদিকে এগিয়ে দাও’, বলল থিও, ‘আর উলটোদিকের দেয়ালের ওই বুকশেলফ দুটোর মাঝের দেয়ালে যে ছবিটা ঝুলছে, ওটার কাছে গিয়ে ভালো করে দেখ, ছবির ওপরের আলোটা জ্বেলে নিও। আমার গল্প ওই ছবিটাকে নিয়েই।’

এখানে জানিয়ে রাখি, তখনকার শিক্ষিত সমাজে থিওর বিশেষ খ্যাতি ছিল একজন চিত্র সংগ্রাহক হিসেবে। বেশ কিছু পুরানো মাস্টারপিস আর অষ্টাদশ শতাব্দীর দারুণ কিছু ওয়াটারকালার ছিল তার সংগ্রহে। বেশিরভাগই বেশ মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য, সবই বিভিন্ন নিলাম থেকে দাঁও মেরে অল্প দামে কেনা। যৌবনের একটা বড় অংশই সে কাটিয়েছে এ কাজ করে। আমি নিজে অবশ্য ছবির তেমন সমঝদার নই, আর থিওর সাথে আমার পছন্দেও অমিল ছিল, তাই ওসব নিয়ে তেমন মাথা ঘামাইনি কখনও।

ওর নির্দেশমতো আমি ঘরের এক পাশের দেয়াল ঘেঁষে রাখা বুকশেলফগুলোর দিকে এগুলাম। ঘরের আবছা আলোয় দুটো শেলফের মাঝের দেয়ালে একটা মাঝারি আকৃতির পেইন্টিং ঝুলছিল।

‘আলোটা জ্বেলে দাও।’

থিওর কথায় মাথার ওপরের বাতিটা জ্বালতেই ছবিটা পরিষ্কার চোখে পড়ল—ভেনিসের বিখ্যাত কার্নিভালের দৃশ্য। ইতালির ভেনিস শহরের এ কার্নিভাল পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত লোকউৎসবগুলোর একটি। বছরের একটি বিশেষ দিনে সন্ধের পর থেকে শুরু হয়ে এটা চলে সারা রাত। নানা দেশের মানুষ এই উৎসবে অংশ নিতে বছরের এই সময়টায় এই শহরে এসে ভিড় জমায়। উৎসবের মুল কর্মকাণ্ড হলো নানা রঙবেরঙের অদ্ভুত মুখোশ, যা শুধু ভেনিস শহরেই তৈরি হয় তা পরে দলে দলে শহরের

অলিগলি, ব্রিজ, শুঁড়িখানায় রাতভর ঘুরে বেড়িয়ে হল্লা আর নাচানাচি করা আর ভেনিসের বিখ্যাত গণ্ডোলায় চড়ে গ্র্যান্ড ক্যানালে ঘুরে বেড়ানো। ছোকরা থেকে বুড়োবুড়ি কেউই বাদ যায় না উৎসবে অংশ নিতে। তবে মুখোশের কারণে কাউকে চেনা যায় না বলে অনেকেই সে সুযোগ নিয়ে এ রাতে বেলেল্লাপনায় মেতে ওঠে।

থিওর ঘরের এই পেইন্টিংটায় সেই কার্নিভালের একটা দৃশ্য আঁকা হয়েছে—গ্র্যান্ড ক্যানালের ঘাটের লাগোয়া এক বিশাল খোলা চত্বরে অসংখ্য নারী পুরুষ সমবেত হয়ে হুল্লোড় করছে, সবাই মুখোশ পরা, বেশিরভাগের চুলও অদ্ভুত কায়দায় বাঁধা। এদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজিকর আর গাইয়ে নাচিয়ের দল। সময়টা রাত্রি। দলে দলে মুখোশধারী জেটি থেকে গণ্ডোলায় চড়ছে, অনেকগুলো গণ্ডোলা ক্যানালের মাঝামাঝি চলে এসেছে, সবগুলোয় লোক ঠাসা। দৃশ্যের স্থানে স্থানে টর্চ আর মশালের আলোয় আলোকিত, বাকি জায়গা অন্ধকার। আলো আঁধারির এই অদ্ভুত মিশেল ছবিটায় কেমন অপার্থিব আর অশুভ আবহ এনে দিয়েছে। দারুণ একটা কাজ বটে! মনে মনে শিল্পীর দক্ষতার প্রশংসা করলাম। কিছুটা কৃত্রিমতার ছোঁয়া থাকলেও আমার অনভিজ্ঞ চোখে কাজটাকে একটা মাস্টারপিস বলেই মনে হলো।

আলো নিভিয়ে দিতেই ছবিটা আবার অন্ধকারে ঢাকা পড়ল। এক পেগ হুইস্কি ঢেলে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এ ছবি তো তোমার কাছে আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না, অনেকদিন ধরেই তোমার কালেকশনে আছে নাকি এটা?’

‘বহুদিন’ থিও বলল, ‘বলতে পার, যত দিন এটা আমার কাছে থাকা উচিত তারচেয়ে বেশি সময় এটাকে আমি আগলে রেখেছি।’ চেয়ারে একটু নড়েচড়ে আরাম করে মাথা এলিয়ে বসল সে। অন্ধকারে ওর মুখ আমি ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম না। ‘ঘটনাটা কখনও কাউকে বলিনি। হয়ত বললেই ভালো করতাম, তা হলে আজ এটা যেভাবে আমার মনের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনটা হয়তো হত না। তোমার আপত্তি না থাকলে গল্পটা তোমাকে বলে একটু হাল্কা হতে চাই।’

থিওকে এত গম্ভীরভাবে কথা বলতে কখনো শুনিনি। মনে মনে একটু চমকে গেলেও মুখে সে ভাব না দেখিয়ে মুচকি হেসে বললাম, ‘নিশ্চয়ই। কোনো আপত্তি নেই আমার তোমার বোঝা হাল্কা করতে। শুরু করো।’

‘হায়! তখন যদি জানতাম এর কী মূল্য আমায় দিতে হবে!’

থিওর কথা

আমার গল্পের শুরু প্রায় ৭০ বছর আগে আমার শৈশবে। আমি ছিলাম বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। আমাকে তিন বছর বয়সে রেখে মা মারা যান। বাবা আর্থিকভাবে যথেষ্ট সচ্ছল ছিলেন আর একমাত্র সন্তানের প্রতি তার টানও ছিল প্রবল। আজকালকার সময় হলে তিনি নিজেই হয়তো আমাকে মানুষ করার ভার নিতেন, কিন্তু সেই সময়টা ছিল ভিন্ন, ব্যবসার কাজেও তাকে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে হতো। সুতরাং অবধারিতভাবে আমার জীবনে শুরু হলো একের পর এক আয়াদের যাওয়া আসা। তাদের কাছেই আমার ছোটবেলাটা কেটে গেছে এবং বেশ ভালোভাবেই কেটেছে বলা যায়। সবাই ছিল দয়ালু, স্নেহপ্রবণ মানুষ, ওই সময়টার কিছুই প্রায় মনে না থাকলেও এটুকু বলতে পারি যে তাদের সাথে কোনো কষ্টের স্মৃতি আমার নেই।

আমার বয়স যখন সাত, আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ডেভনে, খালা খালুর কাছে। আমার মায়ের ওই একটিই বোন। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান, সন্তানের সেই শূন্যস্থানটা পূরণ করি আমি। ডেভনে খালুর ছিল বিশাল জমিদারি। কিন্তু তাঁরা নাক উঁচু স্বভাবের মানুষ একেবারেই ছিলেন না, গাঁয়ের সবার সাথে আমাকে স্বাধীনভাবে মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলেন। আশেপাশের পাড়া প্রতিবেশী, গাঁয়ের কৃষক, কামার, দোকানি, বাড়ির সহিস, এস্টেটের কর্মচারী আর তাদের আমার সমবয়সী ছেলেদের সাথে সারাদিন খেলে বেড়াতাম। সেই ছোট বয়সটা এরকম খোলা প্রকৃতিতে কাটানোর সুগভীর প্রভাব পরবর্তীকালে পড়েছিল আমার স্বাস্থ্যের উপর। এক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আর শক্তিশালী কিশোর হয়ে আমি বেড়ে উঠতে থাকি, এর পরে আমার বাকি জীবনেও আমি রোগে ভুগেছি খুব কম।

বাড়ির ভেতরের জীবনটা ছিল অবশ্য সম্পূর্ণ অন্যরকম। ভৃত্যরা ছাড়া পুরো বাড়িতে মানুষ আমরা তিন জন, শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট ছিল আমাদের প্রতিদিনের জীবন। খালা খালু দুজনেই ছিলেন বইয়ের পোকা। বিশ হাজারের বেশি বইয়ের বিশাল এক লাইব্রেরি ছিল ফ্যামিলি প্যালেসের দোতলায়। আমাকে বই পড়তে প্রচুর উৎসাহ দেয়া হতো। তাঁদের উৎসাহেই আমার পনেরো বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই অনেকগুলো বিখ্যাত ক্লাসিক, আত্মজীবনী, ভ্রমণ আর ইতিহাসের বই পড়ে ফেলি, আমার জন্য প্রয়োজনে তাঁরা লন্ডন থেকে বই আনিয়ে দিতেন। ডেভনের সেই বছরগুলোয় তৈরি হওয়া পাঠের ক্ষুধা আমার মধ্যে এরপরে সারাজীবন ধরে থেকে গেছে।

বই পড়া ছাড়া আমার খালার একটা মস্তবড় দুর্বলতা ছিল পেইন্টিং। মুলত ইংলিশ পেইন্টারদের আঁকা ওয়াটারকালারেই ছিল তাঁর বেশি আগ্রহ, তবে এর পাশাপাশি বেশ কিছু পুরানো ক্লাসিক পেইন্টিংও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। খুব বেশি দামি চিত্রকর্ম না থাকলেও অপেক্ষাকৃত কম বিখ্যাত কিন্তু উঁচুদরের শিল্পীদের আঁকা বেশ কিছু ভালো কাজ তিনি জোগাড় করতে পেরেছিলেন। প্রিয়তমা স্ত্রীর এ শখের ব্যাপারে মহামান্য লর্ড অফ দ্য এস্টেট অর্থাৎ আমার খালু ছিলেন অতি উদার। নিজের এ বিষয়ে তেমন আগ্রহ বা জ্ঞান না থাকলেও স্ত্রীর আবদার তিনি খুশি হয়েই মেটাতেন। পেইন্টিং-এর প্রতি আমার আগ্রহ দেখে মেরি খালা অত্যন্ত খুশি হন, সম্ভবত আমার মধ্যে তিনি তাঁর শখের একজন উত্তরাধিকারীকে খুঁজে পেয়েছিলেন। আমাকে তিনি ছবি কাকে বলে এবং তা কেমন করে দেখতে হয় সে বিষয়ে শেখাতে শুরু করেন, তাঁর কথায় আমি বেশ কিছু বিখ্যাত আর্টিস্টদের জীবনীও তখন পড়ে ফেলি। এই ছবিগুলো দেখতে দেখতে চিত্র বিষয়ে আমার নিজের স্টাইল তৈরি হয়। সাগরপারের ছবি, খোলা আকাশ আর উন্মুক্ত প্রান্তরকে ফুটিয়ে তোলা জলরঙে আঁকা ছবি ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। স্থিরজীবন বা চার্চকে উপজীব্য করে আঁকা ছবিগুলো আমাকে তেমন টানেনি, মেরিখালাও ওসবের ভক্ত ছিলেন না। তবে তিনি কখনোই চাননি আমি তাঁর স্টাইল অনুসরণ করি, আমার নিজের পছন্দ স্বাধীনভাবে গড়ে তোলার সুযোগ তিনি আমাকে দিয়েছিলেন, সর্বোপরি শিখিয়েছিলেন মনটা খোলা রাখতে, যা কিছু নতুন আর অজানা তাকে ভয় বা সন্দেহ না করে আগ্রহ আর উৎফুল্লতা নিয়ে তা গ্রহণ করতে। ছবির প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা আর জ্ঞানের জন্য আমি মেরিখালার কাছে কৃতজ্ঞ।

পরবর্তীকালে ডেভন ছেড়ে লন্ডনে চলে আসার সময় আমার অনেকগুলো পছন্দের ছবি তিনি আমার সঙ্গে দিয়ে দেন, ওটাই ছিল আমার প্রথম ব্যাক্তিগত সংগ্রহ। এর অনেক ছবি আমি পরে বিভিন্ন নিলামে বিক্রি করে সেই অর্থে নতুন ছবি কিনেছি। আমি নিশ্চিত খালা বেঁচে থাকলে তিনিও আমাকে এটাই করতে বলতেন, কারণ তিনি নিজেও পুরোনো ছবি পালটে নতুন ছবি এনে তার সংগ্রহে বৈচিত্র্য আনতে ভালোবাসতেন। একটা সময় বেশ ভালো মুনাফা করেছি এসব ছবি বেচে, রীতিমত বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলাম আর্ট ডিলার হিসাবে, হেসে বলে লিও, আমার প্রফেসারির বেতন থেকে এত আয় করার কথা ভাবতেও পারতাম না। এর পাশাপাশি

অবশ্য শিক্ষকতা আর নিজের গবেষণার কাজও চালিয়েছি নিয়মিত, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নিজ বিভাগেও নিজের একটা সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করে নিতে পেরেছিলাম।

আমার এতক্ষণের এই ভূমিকা থেকে তুমি বুঝতে পারবে কী করে আমি ছবির পাগল হয়ে উঠলাম এবং চিত্রকর্মের বেচাকেনা কীভাবে আমার পেশায় পরিণত হলো। কিন্তু এই ছবি নিয়েই একদিন আমার জীবনে যা ঘটল তা তুমি ভাবতেও পারবে না, সেই গল্পই তোমাকে আজকে বলব। আবারো বলছি, তোমার কাছে এ গল্প অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এর প্রতিটা কথা সত্যি।

সময়টা ছিল ইস্টারের ছুটির শুরুতে বসন্তের দারুণ একটা দিন। দুসপ্তাহের জন্য লন্ডন গিয়েছিলাম, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আমার গবেষণার জন্য কিছু বইপুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার হয়ে পড়েছিল, তার সাথে দুএকটা ছবি কেনাবেচার কাজও ছিল। যে দিনটার কথা বলছি, সেদিন দুপুরে ছবির একটা বড় নিলাম হচ্ছিল। সকালবেলা নিলামঘরে গিয়ে ক্যাটালগ দেখে দুটো পুরনো মাস্টার স্কেচ আর একটা খুব ভালো অয়েল পেইন্টিং পছন্দ করে রাখলাম। তৈলচিত্রটির দাম আমার সামর্থ্য ছাড়িয়ে যাবে এই আশঙ্কা থাকলেও স্কেচ দুটো কব্জা করতে পারব এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছিল। নিলামঘর থেকে বের হয়ে খানিক এদিক ওদিক বেড়ালাম। আহ, দিনটার কথা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে—বসন্ত-সূর্যালোকে ব্লুমসবারি থেকে সেন্ট জেমসের দিকে হেঁটে যেতে যেতে দেখছিলাম রাস্তার দুপাশে ফুটে আছে থোকা থোকা ম্যাগনোলিয়া আর চেরি ব্লসম। দুপাশের প্রাচীন, অভিজাত বাড়িগুলোর পটভূমিকায় সেগুলোকে ছবির মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। বাসন্তী হাওয়ায় আর ফুলের এই সুগন্ধে আমার মনটা অকারণেই খুশি আর ভবিষ্যতের জন্য আশায় ভরে উঠল। জীবন সম্পর্কে আমি সবসময়েই আশাবাদী আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ, আগেও ছিলাম, এখনও তাই আছি।

দুপুরে নিলাম শুরুর কিছুক্ষণ আগে আবার নিলামঘরে ফিরে এলাম ছবিগুলোকে আরেকবার ভালো করে দেখে নেওয়ার জন্য। সকালে পছন্দ করে রাখা তৈলচিত্রটাকে আরেকবার খুঁটিয়ে দেখলাম, এবার কিন্তু ওটাকে আর তত ভালো লাগল না, খানিক ভেবেচিন্তে ওটাকে পছন্দ থেকে বাদ দিলাম। কিন্তু স্কেচগুলোকে দ্বিতীয়বার দেখে আগের চেয়েও ভালো লাগল, ওগুলো থেকে অন্তত একটা কেনার ব্যাপারে আমি ছিলাম বদ্ধপরিকর। এর পাশাপাশি দুটো জলরঙে আঁকা ছবি চিহ্ন দিয়ে রাখলাম। জানতাম

যে নিলামে আসা অন্য ডিলাররা এগুলোর কাছে খুব একটা ঘেঁষে না যদিও উপযুক্ত খদ্দের ধরতে পারলে এগুলো বেশ ভালো দামে বিকোয়। ক্যাটালগটাকে পকেটে পুরে আমি এদিক সেদিক ঘুরে নিলামে আসা অন্য ছবিগুলো দেখে বেড়াতে লাগলাম।

তখনই, বলতে গেলে হঠাৎ করেই ছবিটা আমার চোখে পড়ল। দুটো ধর্মীয় চিত্রের মাঝের খানিক অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা ফাঁকে ঝুলছিল ছবিটা। ভেনিশিয়ান কার্নিভালের একটা তৈলচিত্র। আমি যখন প্রথম দেখি তখন ছবিটা ছিল বেশ খারাপ অবস্থায়, অনেকদিন পরিষ্কার করা হয়নি, ফ্রেমও ছিল জায়গায় জায়গায় চলটা ওঠা। এধরনের উৎসব বা মেলার ছবি আমার যে খুব পছন্দ তা নয়, কিন্তু এই ছবিটায় কিছু একটা ছিল যা আমাকে দীর্ঘসময় এর সামনে দাঁড় করিয়ে রাখল। ছবিতে ফুটে ওঠা রাতের দৃশ্য, মুখোশ পরা ফুর্তিবাজ লোকজন, এখানে ওখানে জ্বলতে থাকা টর্চ আর লণ্ঠনের আলো, চাঁদের আলোয় গ্র্যান্ড ক্যানাল, ব্রিজ, গণ্ডোলা, বিশাল চত্বর বা পালাজ্জোর একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সারিসারি বিল্ডিং আর সেগুলোর খোলা জানালায় জ্বলতে থাকা মোম আর লণ্ঠনের আলো—এই সবই আমাকে অনেকক্ষণ ধরে মোহাচ্ছন্ন করল। আগেই বলেছি ছবিটায় অসংখ্য মানুষের অবয়ব বিভিন্ন আকারে আঁকা হয়েছে, তাদের মধ্যে কারো কারো মুখ বেশ স্পষ্ট। মুখোশ থাকা সত্ত্বেও উচ্চ নাসা আর কাটাকাটা সুগঠিত মুখাকৃতি থেকে তাদের বেশিরভাগকেই খাঁটি ভেনিশিয়ান বলে চেনা যাচ্ছে। খুব খেয়াল করে দেখে ভিড়ের মধ্যে আমি বেশ কিছু আরব আর ইথিওপিয়ানকেও আবিষ্কার করলাম। কী যেন অদ্ভুত কিছু একটা আছে ছবিটায় যেটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না।

এমন ছবি এর আগে কখনও দেখিনি।

হাল্কা লাঞ্চ সেরে নেওয়ার জন্য নিলাম শুরুর ঠিক আগে আগে পাশের ক্যান্টিনে গেলাম, সারাক্ষণ মন জুড়ে রইল ভেনিশিয়ান ছবিটা। ফিস এন্ড চিপস, হান্টার বিফ আর এক কাপ কফি দিয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ফিরে এলাম, এসে দেখি ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে। তখনও তেমন লোকজন না আসায় হলঘর ফাঁকাই ছিল, আমি নিলাম মঞ্চ থেকে দূরে দরজার কাছাকাছি একটা সিটে আরাম করে বসলাম। আস্তে আস্তে রুম ভরে উঠতে লাগল। লোকজনের মধ্যে আমি বেশ কিছু পেশাদার ডিলার এবং বিখ্যাত চিত্রসংগ্রাহকদের কয়েকজন এজেন্টকে দেখতে পেলাম। আমাকে কেউ চেনে না।